# তুরস্ক ঃ আত্মপরিচয় সংকটে এক ঐতিহ্যবাহী জাতি

আবূসামীহাহ্ সিরাজুল ইসলাম

তুর্কী জাতির ইতিহাস 'ঐতিহ্য ও অর্জনে' ভরপুর। বিগত কয়েকশত বছর ধরে তারা তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত এক সাম্রাজ্য শাসন করেছে। তারা সবসময়ই যে ঐতিহ্যবাহী ছিল এমনটা নয়। এমন একটা সময় তাদের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে যখন তারা মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করেছে। সপ্তম-অষ্টম খৃস্টীয় শতকে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে মধ্য এশিয়া মাড়িয়ে চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ইসলামের আলোকাভায় উদ্ভাসিত করে তুললে তুর্কীরাও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জীবনের গন্ডি মাড়িয়ে সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল পথে পথ চলতে শুরু করে। তারপর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তুর্কীদের একটি গোষ্ঠী (উসমানীয়া) বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষে এসে এর যে পতন শুরু হয় তা তাকে ফেলেছে এক মারাত্মক আত্মপরিচয় সংকটে।

তুর্কী জাতির উত্থান শুরু হয় মূলত খৃস্টীয় ১০ম শতকে সেলজুকদের মাধ্যমে। আব্বাসীয় খিলাফতের শক্তি যখন দূর্বল হতে শুরু করে তখন মধ্য এশিয়া থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে নতুন শক্তির ধারা বইয়ে দিতে আসে সেলজুক বংশীয় তুর্কীরা। তারা আব্বাসীয় বংশের সামরিক ক্ষমতা হস্তগত করে এবং প্রকৃত শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। 'খলিফা কুরাইশী হতে হবে', এধারণার কারণে তারা নতুন একটি পদ সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় 'সুলতান' বা ক্ষমতার অধিকারী। খলিফার পদ হয়ে পড়ে নামকাওয়াস্তে মাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় সেলজুক তুর্কীদের হাতে। সেলজুক সুলতানের অধীনে এক কমান্ডার ছিলেন উসমান। তাঁকে আনাতোলিয়ার জায়গীর প্রদান করেন সেলজুক সুলতান। এখান থেকেই শুরু হয় উসমানিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান। উসমানের বংশধররা পর্যায়ক্রমে পুরো আনাতোলিয়া ও এশিয়া মাইনর দখল করে নেয় এবং সেখান থেকে পূর্ব ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। খৃস্টীয় ১৪৫৩ সালে উসমানিয়া তুর্কীরা 'পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য' বা বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল দখল করে নিলে উসমানিয়া সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে পৌঁছার পর্যায়ে দ্রুত ধাবিত হয়। ভূমধ্যসাগরের একাংশ, কৃষ্ণ সাগর, মর্মর সাগর হয়ে পড়ে তুর্কী নৌবাহিনীর নিজস্ব হ্রদের মতো। এরপর ধীরে ধীরে উসমানীয়া তুর্কীরা দখল করে নেয় সমগ্র পূর্ব ইউরোপ।

উসমানীয়া তুর্কীরা মুসলিম খিলাফতের ও দাবীদার হয়ে পড়ে তখন যখন সুলতান সেলিম মক্কা-মদীনা সহ সমগ্র হিজায উসমানীয়া সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসেন। এরপর মিশর, শামসহ আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম প্রদেশগুলোতে উসমানিয়া সালতানাতের, যা ইতিমধ্যে উসমানীয়া খিলাফতে রূপধারণ করেছে, প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। খিলাফতে রাশেদার পর বনী উমাইয়্যা এবং তারপর বনী আব্বাস, আর এখন উসমানীয়া তুর্কীরা মুসলিম জাহানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব - কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসে।

উসমানীয়া তুর্কীদের উত্থানের পেছনে যে জিনিষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো বারুদের সফল ব্যবহার। আর এজন্য সমসাময়িক তিনটি সাম্রাজ্য ইতিহাসে ঐলভযমষঢণর ঋবযধরণ বা 'বারুদী সাম্রাজ্য' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উসমানীয়া সাম্রাজ্য ছাড়াও বাকী দু'টি বারুদী-সাম্রাজ্য হচ্ছে ইরানের সাফাভী সাম্রাজ্য ও ভারতের মোগল সাম্রাজ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে উসমানীয়দের ন্যায় সাফাভী ও মোগলরাও ছিল মধ্য এশিয়ার তুর্কী সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও চীনারা বারুদের আবিষ্কর্তা, তুর্কীরা এর সফল ব্যবহার করেছে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বন্দুক ও কামানের উদ্ভাবন করে। সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ্ নতুন কামানের ডিজাইন করেছেন যা দিয়ে কন্সটান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল জয় করা হয়েছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাতেও অনন্য ভূমিকা পালন করেছে উসমানীয়া তুর্কীরা। সুলতান সুলায়মান, যিনি ইতিহাসে সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট বা মহানুভব সুলায়মান হিসেবে পরিচিত, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এত সুন্দর ভূমিকা পালন করেন যে তাঁর পূর্ব ইউরোপীয় প্রজারা তাঁকে ক্কীটষ ঐধশণরম্ব বা 'আইনদাতা' হিসেবে সম্মান করতো যদিও সুলায়মান আইনদাতা ছিলেন না; ছিলেন শুধু শরীয়াহ্ আইনের প্রয়োগ-কর্তা মাত্র।

সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মাণেও ছিল উসমানীয়া তুর্কীদের বিশাল ভূমিকা। ইস্তাম্বুলকে রাজধানী করে তাঁরা ইসলামকে নিয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপের গভীরে আর তিনটি মহাদেশে অবস্থিত মুসলিম ভূমি শাসন করেছেন। ইস্তাম্বুল তৈরী করেছিল ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝে সেতুবন্ধন।

আজকের ইস্তাম্বুল এখনও বহন করছে মুসলিম স্থাপত্যকলার অনন্য নিদর্শন। তুর্কী স্থপতি মিমার সিনানকে গণ্য করা হয় সর্বকালের অন্যতম সেরা স্থপতিদের মধ্যে। তাঁকে আরো গণ্য করা বিশ্বের প্রথম ভূমিকম্প বিশারদ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সিনান তাঁর কর্মজীবনে ৩৫০ এর অধিক স্থাপত্য নির্মাণ করেন যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মনোরম মসজিদ, প্রাসাদ, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, সৌধ, সরাইখানা, জল-প্রণালী, সেতু ও অন্যান্য স্থাপত্য। কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিনানের এসব কীর্তি এখনও বর্তমান তুরস্কে এবং পূর্ব ইউরোপের অনেক অঞ্চলে।

আজকের ইস্তাম্বুলকে বলা হয় মসজিদের শহর। ইস্তাম্বুলের নীল মসজিদ বা সুলতান আহমেদ মসজিদ এখনও নজর কারে পর্যটকদের। বাইজেন্টিন রোমানদের ক্যাথিড্রাল 'আয়া সোফিয়ার' সাথে পাল্লা দিতে তৈরী করা হয় এই মসজিদ, যার স্থপতি ছিলেন সিনানের ছাত্র সাদেককর আহমেদ আগা। ইস্তাম্বুলের অসংখ্য স্থাপত্য কীর্তির মাঝে আরো রয়েছে আইয়ুব সুলতান মসজিদ যা তৈরী করা হয়েছে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাহাবী আবূ-আইয়ূব আনসারীর (রাঃ) কবরের কাছে।

তুর্কীরা আরো খ্যাতি অর্জন করেছিল ইসলামী চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য। হস্তলিপি শিল্প বা ক্যালীগ্রাফী শিল্প পূর্ণতার মাত্রায় পৌঁছে তাদের সময়ে। কুরআনের আয়াতের ক্যালীগ্রাফী বিভিন্ন স্থাপত্যের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

অটোমান (উসমানীয়া) তুর্কীরা বারুদের ব্যবহার ছাড়াও সামরিক বাহিনীর শৃঙ্খলা বিধানেও আনে নতুন সংযোজন। তুর্কী জেনিসারীরা ছিল ইউরোপীয়দের ত্রাসের কারণ।
এতসব অর্জন তুর্কীদের পক্ষে সম্ভব ছিল শুধু যাযাবর অসভ্যতা থেকে ইসলামের ছোঁয়ায় অবগাহিত সভ্যতার পথে আসার কারণেই।
প্রত্যেক জাতিরই যাকে উত্থান-পতনের ধারা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে উসমানীয়া সাম্রাজ্যেও ধরে পতনের তরান্বিত ধারা। জাতি হিসেবে উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষয় যখন পেয়ে বসে তখনই নামে ধস। এদিকে খৃস্টীয় ষোড়শ শতক থেকেই ইউরোপীয় জাতিগুলো তাদের অন্ধকার যুগকে পেছনে ফেলে আবিষ্কার ও বিজয়ের নতুন ধারা শুরু করে। উসমানিয়া তুর্কীরা ইউরোপীয়ানদের সাথে উন্নতির এই ধারায় সমানতালে অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্য পরিণত হয় স্ক্রওধডপবটভ মত ঋলরমযণম্ব বা 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' হিসেবে যার মৃত্যু হয় প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

সমস্যা যেখানে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো তুর্কীর দূরবস্থার জন্য একদল জাতীয়তাবাদী নব্যতুর্কী (Young Turks) দায়ী করে বসল ইসলামকে। তাদের মতে ইসলামের জন্যই তুর্কী আধুনিক ইউরোপের সাথে

পাল্লা দিতে পারেনি। ফলে তারা তুরস্কের জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে জোড়পূর্বক তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়ে উঠল। ১৯২২ সালে মুস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্ব উসমানীয়া সালতানাতের ইতি টেনে গড়া হয় তুর্কী প্রজাতন্ত্রের বা তুরস্কের। আর এরও পরে ১৯২৪ সালে ইসলামী খিলাফতেরও ঘটানো হয় অবসান।

কামাল নিজের জন্য আতাতুর্ক উপাধি গ্রহণ করেন যেন তিনিই তুর্কী জাতির জনক। অথচ তার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তুর্কী যে তিমিরে ছিল এখনও তাই আছে। তিনি তুর্কী জাতির মধ্যে কোন নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে পারেননি, শুধুমাত্র প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে দখলদার গ্রীক, ইতালীয়, ফরাসী ও ব্রিটিশ সৈন্যদের তাড়ানো ব্যতিরেকে। জাতি হিসেবে তুর্কীরা সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে যে ভূমিকা পালন করেছে তা কামাল-পূর্ব উসমানীয় খিলাফত যুগে আর তা ছিল ইসলামেরই অবদান।

কামাল পাশা তুর্কীদেরকে তাদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বঞ্চিত করার পরিকল্পনা করলেন। তিনি সমাজ থেকে একে ইসলামী সভ্যতার চিহ্নগুলো মুছে দিতে তৎপর হলেন। তিনি আরবী বর্ণমালা নিষিদ্ধ করলেন; ঐতিহ্যবাহী তুর্কী-ইসলামী পোষাকগুলো নিষিদ্ধ করে ইউরোপীয় পোষাকের প্রচলন ঘটালেন। তিনি শরীয়াহ্ আইন বাতিল করলেন; মহিলাদের হিজাব পড়া নিষিদ্ধ করলেন। এছাড়াও ইউরোপীয় ধারায় বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন যার প্রায় সবগুলোই তুর্কী ও ইসলামী ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কিন্তু কামাল পাশার এসব সংস্কার কি তুরস্ককে বিশ্ব শক্তিতে পরিণত করেছে? না করেনি। বরং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বঞ্চিত তুর্কীদের জন্য তৈরী করেছে আত্মপরিচয়ের এক মহাসংকট। যে সংকটের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাওয়া তুর্কী জাতি কোন কুল কিনারা করতে পারছে না। কামালের ইউরোপীয় ধাঁচের সংস্কার তুর্কীদের শুধু ইউরোপীয় পোষাক এবং ভাষা লেখার জন্য বর্ণমালা দিয়েছে। ইউরোপ তুর্কীদের গ্রহণ করেনি। তুর্কী তার হারানো গৌরবও পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। অর্থনৈতিকভাবেও তুরস্ক তেমন কোন সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। নিজেদের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের উত্তরাধিকার থেকে জোড় করে বঞ্চিত হওয়া তুর্কীরা নতুন শক্তি অর্জনের সত্যিকার কোন ভিত্ রচনা করতে পারেনি কামাল পরবর্তী সময়ে।

একথাও সত্য যে ঐতিহ্যবাহী কোন জাতিকে সুদীর্ঘ সময় কেউ ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করে রাখতে পারেনা। কামালের জীবদ্দশায়ই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ফিরে পাওয়ার সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। এ সংগ্রামে শুরুতে নেতৃত্ব দেন বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রঃ)। অসংখ্য কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেও তিনি কুরআনের শিক্ষা ও আলো বিতরণ করে যান। সাঈদ নূরসীর মতো মানুষেরা বুঝতে পেরেছিলেন তুরস্কের পতন কারণ ইসলাম ছিল না বরং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়াই ছিল এর পতনের কারণ। তাঁরা ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে তুর্কীদের গৌরবময় উত্থানের দিনগুলো ছিল মূলতঃ ইসলামের ছোঁয়ায় আলোকিত দিন। কিন্তু কামাল ও তার সাথীরা এটা বুঝার চেষ্টা করেননি।

সাঈদ নূরসী ও তাঁর মতো আরো অনেকের চেষ্টার ফলে তুর্কীরা আবারও তাদের ইসলামী পরিচিতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও ইসলামপন্থীরা বেশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিগত শতাব্দীর আশি ও নব্বই এর দশকে নাজমুদ্দীন আরবাকানের নেতৃত্বে তুর্কী জনগণ ইসলাম পন্থীদের ক্ষমতায়ও বসায়। কিন্তু ঐতিহ্যবিমুখ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জনগণের শক্তিকে বার বার বন্দুকের নলের মাধ্যমে দাবিয়ে দিয়েছে।

তুর্কীর সর্বশেষ সঙ্কট দাঁড়িয়েছে প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়্যিব আরদোগানের জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিকে ঘিরে। আরদোগান মূলত আরবাকানের ভাবশিষ্য। এজন্য তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ব্যবহার করে আরদোগান সংকটের পর সংকট উত্তরণ করে এসেছেন। আরদোগানের সরকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেছেন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেছেন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তুর্কীর অন্তর্ভুক্তির আলোচনা অগ্রসর করেছেন। এদিকে বিরুদ্ধবাদীরাও

বসে থাকেনি। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এলে নতুন করে সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ্ গুল প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থীতা থেকে নিজের নাম সরিয়ে নেন। যোগ্যতা ও আন্তরিকতার কোনই মূল্যায়ন করেনি আত্মপরিচয় বিস্মৃত তুর্কী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি। শুধু গুলের স্ত্রী হিজাব পড়েন বলেই তারা তাঁর প্রার্থীতার বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে তুরস্কের নির্বাচনী পদ্ধতিতে তাদের প্রার্থীর ও বিজয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী আরদোগান চাচ্ছেন সংবিধান সংশোধন করে সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রেসিডেন্ট আহমেদ নাজদাত শেজার সেখানেও বাঁধ সাধেন। অবস্থা এমন যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নিজেরা ইতিবাচক কোন কাজ করতে পারেনি। কিন্তু আরদোগানের দলকেও তারা ভাল কিছু করতে দিতে চায়না কারণ তাদের গায়ে ইসলামপন্থী হওয়ার চিহ্ন রয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কি করতে পেরেছেন? শুধুমাত্র সরকারী অপিস-আদালত ও শিক্ষাঙ্গন থেকে মুসলিম মহিলাদেরকে হিজাব বঞ্চিত রেখেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী আরদোগানের স্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ থেকে দূরে রেখেছেন। তাঁর দুই মেয়ে নিজ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম পোষাক পড়ে যেতে না পারায় বাইরে পড়াশোনা করেন। কিন্তু তুর্কীদের সাধারণ জীবন থেকে তারা কি ইসলাম তাড়াতে পেরেছেন? তাদের বিগত প্রায় শতাব্দীকাল চেষ্টার পরও অধিকাংশ তুর্কী মহিলা (কিছু বড় শহর বাদে) এখনও হিজাব পড়েন। তুর্কী জনগণ বার বার ইসলাম পন্থীকে নির্বাচনী ম্যান্ডেট দিচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আচরণ শুধুমাত্র একটার পর একটা সংকটই সৃষ্টি করছে তুরস্কের জন্য। গৌরবময় অতীতের অধিকারী এক জাতিকে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকেই তারা বার বার ঠেলে দিচ্ছে। যত তারাতাড়ি এই মহল তাদের কাজের পরিণতি উপলব্ধি করবে ততই তা তুরস্কের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

[লেখক মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরস্থ অলিম্পিয়া কলেজের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক প্রভাষক ও বর্তমানে নিউ ইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিক ও শিক্ষক। যোগাযোগঃ abusamihah@gmail.com]